মহাকর্ষের বেগ

আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ

প্রকৃতিতে চারটি মৌলিক আছে। এর মধ্যে আমরা সবচেয়ে পরিচিত মহাকর্ষের সাথে। চলতে-ফিরতেও একে আমরা সবচেয়ে বেশি অনুভব করে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে কিংবা হাতে ভারী ব্যাগ থাকলেই টের পাই মহাকর্ষের শক্তির। আবার সুন্দর ঝর্ণা বেয়ে পানি নেমে আসেও মহাকর্ষের কল্যাণে। উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও আমাদের দেহের রক্তসঞ্চালনেও আছে মহাকর্ষের ভূমিকা। গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথরা মহাশূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে মহাকর্ষের বদৌলতেই।  
  
কিন্তু মহাকর্ষ কত বেগে চলে? এর কি চলতে আদৌ কোনো সময় লাগে? নক্ষত্রদের মহাকর্ষীয় বন্ধনে আটকা পড়তে গ্রহদের কত সময় লাগে? নাকি ব্যাপারটা ঘটে যায় নিমিষেই, গ্রহ সে যত দূরেই থাক?   
  
ধরুন, সূর্য হঠাৎ করে তার চলার পথ থেকে উধাও হয়ে গেল। শুধু অদৃশ্য নয়, একদম হাওয়া। এই ব্যাপারটা আমরা পৃথিবীতে বসে কখন অনুভব করব বা দেখব? আলো আমাদের চোখে আসলে আমরা কোনো বস্তু দেখি। আর আলোর বেগ সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার। পৃথিবী তো প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার দূর থেকে সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। আলো আসতে সময় লাগে গড়ে ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড। তার মানে এ সময় পরে আমরা জেনে ফেলব সূর্যের হারিয়ে যাওয়ার কথা। অন্ধকার হয়ে যাবে পৃথিবীর আকাশ।   
  
কিন্তু সূর্যের অভাবে মহাকর্ষের কী হবে? সূর্য নেই মানে তো গ্রহদের কক্ষপথ টিকিয়ে রাখার জন্য নেই কোনো শক্তি। কক্ষপথে গোলমাল হবে। কিন্তু সেটা কখন হবে? আলোর মতোই ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড পরে, নাকি আরও আগে বা পরে?   
  
মহাকর্ষের বেগ অসীম হলে সূর্য হারিয়ে যাওয়া মাত্রই গ্রহদের ওপর মহাকর্ষের বলও উধাও হয়ে যাবে। গ্রহরা সাথে সাথে স্বাধীন যাযাবর গ্রহে পরিণত হবে। রওনা হয়ে যাবে গহীন মহাশূন্যের অজানা গন্তব্যের দিকে। আর মহাকর্ষের বেগ আলোর বেগের সমান হলে? পৃথিবী ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড পর্যন্ত সূর্যকে বরাবরের মতোই প্রদক্ষিণ করে যাবে।   
  
আলো আর মহাকর্ষ আলাদা বেগে চললে মজার ব্যাপার হবে। রৌদ্রস্নান করা মানুষ একটা সময় দেখবে আলো নেই। আর মানমন্দিরের জ্যোতির্বিদ অন্য সময় খেলায় করবেন, পৃথিবীর কক্ষপথে গোলমাল বেঁধেছে। কিন্তু আসল ব্যাপার কোনটা?  
  
বিজ্ঞানের ইতিহাসে এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার নজির পাওয়া যায়। নিউটন মহাকর্ষের প্রথম আধুনিক ধারণা দেন। তিনি মনে করতেন মহাকর্ষের বেগ অসীম। বিশ্বাস করতেন, সূর্য হারিয়ে গেলে সে দৃশ্য দেখার আগেই পৃথিবীর গতিপথ পাল্টে যাবে।   
  
মহাকর্ষের এখন পর্যন্ত সবচেয়ে ভাল তত্ত্ব দেন আইনস্টাইন। আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্বের মাধ্যমে। তিনি বিশ্বাস করতেন, মহাকর্ষ চলে আলোরই বেগে। আলোর চেয়ে বেশি বেগে যায় কার সাধ্য! ফলে তাঁর মতে পৃথিবী অন্ধকার ও কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হবে একই সময়ে। এসব ধারণার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর সার্বিক আপেক্ষিকতায়। এ তত্ত্ব সূর্যের চারপাশে গ্রহদের গতিপথ সুন্দরভাবে অনুমান ও ব্যাখ্যা করতে পারে। এতে আছে নিউটনের তত্ত্বের চেয়ে বেশি পূর্বাভাস।   
  
তাহলে কার কথা ঠিক? তা জানতে হলে মহাকর্ষের বেগ সরাসরি মাপতে হবে। চাইলেই তো আর সূর্যকে হাওয়া করে দেওয়া যাবে না। তার মানে অন্য পথে যেতে হবে।   
  
আইনস্টাইনের মহাকর্ষের তত্ত্বে পরীক্ষাযোগ্য কিছু পূর্বাভাস আছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি পূর্বাভাস হলো মহাকর্ষকে স্থানের কাঠামোর বিকৃতি হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। বিকৃতি যত বেশি মহাকর্ষ তত বেশি। এই কথার আছে সুদূরপ্রসারী ফলাফল। স্থান হলো চাদরের মতো নমনীয়। টানিয়ে রাখা চাদরে কোনো বাচ্চা লাফালাফি করলে যেমন এতে টোল পড়ে, পাল্টে যায় পৃষ্ঠের আকৃতি, তেমনি মহাকর্ষ পাল্টে দেয় স্থানকে।   
  
অতএব, স্থানও উপর-নিচে দোল খাওয়ার মতো হয়। অবশ্য শব্দ তরঙ্গের সাথে তুলনাটা আরও ভাল হয়। শব্দ বাতাসের অণুকে সংকুচিত ও প্রসারিত করে। স্থানের এই বিকৃতিকে বলে মহাকর্ষ তরঙ্গ। এ তরঙ্গ চলে আলোর বেগে। অতএব, মহাকর্ষ তরঙ্গ শনাক্ত করা গেলেই পাওয়া যাবে মহাকর্ষের বেগ। তবে স্থানের পরিমাপযোগ্য বিকৃতি খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। অন্তত বর্তমান প্রযুক্তির সে সক্ষমতা নেই। তাহলে উপায়?  
  
গ্রহরা নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করে। অনেকসময় আবার নক্ষত্ররাই পরস্পরকে কেন্দ্র করে ঘোরে। এদের নাম বাইনারি স্টার বা জোড়াতারা। এমন কিছু নক্ষত্রের জীবন শুরু হয়েছিল ভারী নক্ষত্র হিসেবে। সূর্যের চেয়ে অনেক ভারী এসব নক্ষত্র সূর্যের মতো আলো বিলিয়ে জ্বালানি নিঃশেষ করে মৃত্যুবরণ করেছে। পরিণত হয়েছে ব্ল্যাকহোলে। যে মৃত নক্ষত্র থেকে আলোও বের হয়ে আসতে পারে না। এমনও জোড়াতারা আছে যাদের দুটিই ব্ল্যাকহোলে পরিণত হয়েছে। ঘুরছে একে অপরকে কেন্দ্র করে।   
  
কক্ষপথে চলার সময় এরা সামান্য পরিমাণ মহাকর্ষ তরঙ্গ নির্গত করে। বর্তমান প্রযুক্তি দিয়ে যা ধরা সম্ভব নয়। তরঙ্গ নির্গত করে করে এরা শক্তি হারায়। ফলে কক্ষপথ ছোট হয়। একে অপরের কাছে আসে। একসময় মিশে যায় একে অপরের সাথে। এই মিলনের সময় নির্গত হয় বিপুল আকারের মহাকর্ষ তরঙ্গ। মিলনের ক্ষুদ্র মুহূর্তটিতে নির্গত মহাকর্ষ তরঙ্গের শক্তি ঐ সময়ের পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের সব নক্ষত্রের নির্গত আলোর শক্তির চেয়েও বেশি।   
  
আইনস্টাইন ১৯১৬ সালেই মহাকর্ষ তরঙ্গের ভবিষ্যদ্বাণী করেন। তবে একে শনাক্ত করার প্রযুক্তি বানাতে লেগে যায় প্রায় এক শতাব্দী। স্থানের এ আন্দোলন শনাক্ত করতে বিজ্ঞানীরা দুটি নল ব্যবহার করেন। লাইগো নামের এ যন্ত্রের প্রতি নলের দৈর্ঘ্য আড়াই মাইল বা চার কিলোমিটার। নলদুটিকে ইংরেজি এল অক্ষরের মতো ৯০ ডিগ্রি কোণে বসানো হয়। এদের মধ্যে ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন কম্বিনেশনের দর্পণ ও লেজার৷ যা দিয়ে মাপা হয় নলের দৈর্ঘ্য। মহাকর্ষ তরঙ্গ দুই নলের দৈর্ঘ্যকে বদলে দেবে। একেকটার একেকভাবে। দৈর্ঘ্যের পরিবর্তনের পার্থক্যের দেখে বোঝা যাবে তরঙ্গের অস্তিত্ব।   
  
২০১৫ সালে প্রথম মহাকর্ষ তরঙ্গ পাওয়া যায়। পৃথিবী থেকে একশ কোটি আলোকবর্ষ দূরের দুই ব্ল্যাকহোলের মিলনের ফলে তৈরি হয় এ তরঙ্গ। এ পর্যবেক্ষণ ছিল জ্যোতির্বিদ্যার বড় এক সাফল্য। আইনস্টাইনের সার্বিক আপেক্ষিকতার আরেক জোরালো প্রমাণ। তবে এ থেকেও মহাকর্ষের বেগ জানা যায়নি। সেজন্যে প্রয়োজন হয়েছিল আরেকটি পর্যবেক্ষণ।   
  
দুই ব্ল্যাকহোলের মিলন ছাড়াও মহাকর্ষ তরঙ্গ তৈরি হতে পারে। দুই নিউট্রন নক্ষত্রের মিলনেও তা হতে পারে। যদিও নিউট্রন নক্ষত্র সাধারণ ব্ল্যাকহোলের চেয়ে হালকা। তবে নিউট্রন নক্ষত্রের সুবিধা হলো, এদের মিলন শুধু মহাকর্ষ তরঙ্গই তৈরি করে না, নির্গত করে আলোর ঝলক, যা পুরো মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। মহাকর্ষের বেগ বের করতে নিউট্রন নক্ষত্রের মিলন দেখা গেলে তাই সুবিধা হয়।   
  
২০১৭ সালে আসল এ সুযোগ। দুই নিউট্রন নক্ষত্রের মিলনের মহাকর্ষ তরঙ্গ পাওয়া গেল। প্রায় দুই সেকেন্ড পরে শনাক্ত হলো গামা বিকিরণ। গামা বিকিরণ আলোরই শক্তিশালী একটি রূপ। খালি চোখে আমরা দেখি না। দেখার কাজটি করল পৃথিবীর কক্ষপথে থাকা পর্যবেক্ষণকেন্দ্র। এ গামা আলোর উৎস ১৩ কোটি আলোকবর্ষ দূরের এক ছায়াপথ এনজিসি ৪৯৯৩। শেষ পর্যন্ত মহাকর্ষের বেগ মাপার উপাদান হাতে এল বিজ্ঞানীদের।   
  
দুই নিউট্রন তারার মিলনে একইসাথে মহাকর্ষ তরঙ্গ ও আলো তৈরি হয়। ফলে পৃথিবীতে তারা একইসাথে   
পর্যবেক্ষণে ধরা পড়া উচিত। দেখা গেল, ১৩ কোটি আলোকবর্ষের দুই তরঙ্গ দুই সেকেন্ডের ব্যবধানে পৃথিবীতে এসে পৌঁছেছে।   
  
এ থেকেই আমরা উত্তর পেয়ে গেলাম। মহাকর্ষ আর আলো চলে একই বেগে। আবারও আইনস্টাইন সঠিক প্রমাণিত হলেন। আর এ তথ্যের মাধ্যমে মিলে গেল আপাতদৃষ্টিতে দুই আলাদা জিনিসের বৈশিষ্ট্য। মহাকর্ষ ও আলোর বেগ। বিজ্ঞানীদের আশা, ভবিষ্যতে হয়ত জানা যাবে কোথায় এ দুইয়ের সংযোগ।

সূত্র: বিগথিংক ডট কম

লেখক: প্রভাষক, পরিসংখ্যান বিভাগ, সিলেট ক্যাডেট কলেজ  
  
<https://bigthink.com/hard-science/speed-of-gravity/>